❖ 'আমার কৈফিয়ৎ' নামকরণ ঃ কৈফিয়ৎ-এর পটভূমিকা :

অভিযুক্ত হলেই মানুষকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। অভিধানে এর একটি অর্থ নির্দিষ্ট হয়েছে 'কারণ প্রদর্শনসহ জবাব'। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হবার পর থেকেই নজরুলকে ক্রমশ

অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। মোহিতলাল ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, 'বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নাই, মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী উত্থান কামনা নাই, মানবাত্মার জয় ঘোষণা ইহাতে নাই। কাব্যে কোনও সমস্যার বা মনস্তত্ত্বের দোহাই নাই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভাল জমিয়াছে।' ...."মুস্কিল হইতেছে এই যে, দুষ্ট খোকাও বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে তাহা নাটকের নৃত্য নয়, দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্মের উল্লাস হিসাবেই তাহা উপভোগ্য (সাহিত্যের আদর্শ)"। আধুনিক লেখকদের মুখপাত্র 'প্রগতি' পত্রিকায় লেখা হল, 'নজরুল ইসলাম খুব কিছুদিন জোর গলায় জয়ধ্বনি করলেন, তার অধিকাংশই ফাঁকা আওয়াজ (শ্রাবণ, ১৩৩৬)।' গোঁড়া মুসলমানেরাও নজরুলের হিন্দু-ঘেঁষা মনোভাব বা হিন্দু পুরাণ ও দেবদেবীদের তাঁর কাব্যে উল্লেখের প্রবণতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছিলেন, 'মুছলমান সাহিত্যিকগণ শত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়া এই পাপ আদর্শকে জাতির সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা (এছলাম ও নজরুল ইসলাম, নজির আহমদ চৌধুরী, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৩৫)।' অথবা, '... যখন হইতে তিনি বিদ্রোহী সাজিয়া বিধাতার বুকে হাতুড়ী পিটিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতেই মুসলমান তাঁহাকে বর্জন করিয়াছে (কাজীর কেরদানী; শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, ইসলাম দর্শন, মাঘ ১৩৩৪)।'

অপরদিকে হিন্দুকন্যাকে বিবাহ করার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু এবং ব্রাহ্মরা তাঁর প্রতি রীতিমতো অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভের কথা নজরুল গোপনও রাখেন নি। আসলে হিন্দু-মুসলমান দুই শ্রেণীরই গোঁড়া সম্প্রদায়ের হাতে নজরুল সমানভাবে আক্রান্ত, 'আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে ত মনে পড়ে না। ... হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে, যে নিবিড় প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। .... আজিকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ—আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন (অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানকে লেখা চিঠি। আব্দুল কাদের সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' থেকে উদ্ধৃত)।' ধর্মের মতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও নজরুল নিজস্ব পথের পথিক। ১৯২০-২১ থেকে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন তাঁরা অনেকেই পরে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। রুশবিপ্লবের প্রভাব তখনকার তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকের ওপরেই পড়েছিল। নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন। ১৯২১-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হবার সময় তিনি মুজফ্‌ফর আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও পার্টির সভ্য হন নি। অপরদিকে হেমন্তকুমার সরকারদের সাহচর্যে The Labour Swaraj Party এবং এর মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন। লাঙল পত্রিকারও মূল আদর্শ ছিল সাম্যের মন্ত্র প্রচার।

পরাধীনতার বেদনা নজরুল মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীবাদ, সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলনে তাঁর আস্থা ছিল না। বরং তিনি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পক্ষপাতী, সমস্ত রকম

বৈষম্যের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রতিবাদ। তাই তাঁর কাব্যে শ্রেণীচেতনা ও সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রাধান্য পেয়েছে। আবার কেউ কেউ তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন, "আমি চিরশিশু, চিরকিশোর—একথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি (বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল)।" এই সব কারণেই নজরুলের কৈফিয়ৎ দেওয়াটা এত জরুরি হয়ে উঠেছিল। কেবল অভিযোগের জবাবই নয়, এই সুযোগে নিজের জীবনদর্শনটিকেও তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। একদিকে সমালোচকদের যেমন তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন অপরদিকে নিজের আদর্শে থেকেছেন অবিচল। "আমার কৈফিয়ৎ" তাই একদিকে প্রতিপক্ষের জবাব, অপরদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন।